ভারত, জাপান ও কোয়াডঃ একটি "অপরিহার্য" অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

সুমিতা নারায়ণন কুট্টি

৫ জুন, ২০২৩

নতুন দিল্লীতে একটি ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্ডো-প্যাসিফিক (এফওআইপি) নিয়ে তাঁর দেশের নতুন পরিকল্পনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ঘোষণা করেন, "এটিকে (অর্থাৎ পরিকল্পনাটিকে) সম্পাদন করার জন্য ভারত একজন অপরিহার্য সহযোগী।" মার্চ মাসে তাঁর ভারত ভ্রমণের সময় তিনি যে বক্তব্যটি রাখেন তা, বিশ্বের বর্তমান শৃঙ্খলার মধ্যে ভারত ও জাপানের যে "অত্যন্ত বিশিষ্ট একটি অবস্থান" এবং ওই শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তাকে আরও জোরাল করতে তাদের যে "সুবিশাল দায়িত্ব", তার উপর জোর দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি, কোয়াডের সদস্য হিসেবে এই দুই দেশ, বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের যৌথ অবদানকে সযত্নে লালন করে চলেছে।

নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মর্যাদা – ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যে তিনটি বিষয়কে বর্তমান সরকার সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, সেই তিনটির ক্ষেত্রেই জাপান আজ ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার। নেতৃশ্রেণীর বিদেশ ভ্রমণকে যদি সূচক হিসেবে ধরা হয়, তাহলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর শাসনের প্রথম দফায় (২০১৪-১৯) সব চেয়ে বেশি গিয়েছেন জাপানে, এবং দ্বিতীয় দফায়, মে মাসে হিরোশিমায় সংঘটিত জি-৭ সম্মেলন সহ, অন্তত আরও তিনবার তিনি জাপান ভ্রমণ করেছেন।

তাঁর পূর্বসুরীদের মতই, মোদী ভারত-জাপান সম্পর্কটিকে নির্মাণ করেছেন প্রতিষ্ঠিত কিছু কৌশলগত অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে। এই সম্পর্কগুলি হল দ্বিদেশীয় (ভারত-জাপান), ত্রিদেশীয় (ভারত-জাপান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ভারত-জাপান-অস্ট্রেলিয়া), এবং চতুর্দেশীয় (ভারত-জাপান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া)। এই সামগ্রিক চিত্রটিকে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, এই অংশীদারিত্বটিকে কেন স্থায়ী বলে মনে হয় এবং ভারতের সফলতম পদক্ষেপের মধ্যে একটি বলে ধরা হয়।

মৈত্রীবন্ধন নয়, সমস্যা-নির্ভর নেটওয়ার্কিং

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক বিন্যাসের মধ্যে, ভারত কিভাবে তার নিজের স্বার্থকে অনুসরণ করেছে, তা না বুঝে ভারত-জাপান সম্পর্ককে, এবং বিস্তৃত অর্থে, কোয়াডকে খুঁটিয়ে দেখা যায় না। ভারতের অন্যান্য প্রধান পদক্ষেপগুলির মধ্যে কয়েকটি হল, কৌশলগত স্বশাসনের মূল নীতি, এবং এই নীতিটিকে গঠন করার জন্য কৌশলগত অংশীদারিত্বের (মৈত্রীবন্ধন নয়) নির্মাণ, এবং আজকের ভারতের প্রকটতম কৌশলগত সমস্যার (আত্মনির্ভরতাকে অতিক্রম করে) জন্য একটি *নেটওয়ার্কিং* প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা।

আদর্শগত সংঘবদ্ধতা নয়, সমস্যা-নির্ভর মৈত্রীবন্ধনই আদতে ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরালো করে – এই অংশীদার দেশগুলি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও জাপান। এই অবস্থানটি নেওয়া বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে যে অস্বাভাবিক কোনও বিষয় নয় এবং, "আমরা (জাপান) কোনও রকম আদর্শকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দিই না" – নতুন দিল্লীতে কিশিদার এই দাবী সেটিকেই সমর্থন করে। সম্পর্ক তাই, স্বার্থ (নিরাপত্তা,

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি), অবস্থান (ভাগের এলাকা, রাজনোইতিক-ভৌগোলিক কাঠামো), সংস্থার সদস্যপদ (যেমন, কোয়াড, বিআরআইসিএস, এসসিও), এবং সমস্যাজনক অঞ্চল (সামুদ্রিক, শক্তি, জলবায়ু) – এগুলির উপর নির্ভর করে নির্মিত হয়। নীতিনির্ধারক ও নেতৃত্ব, উভয়ের জন্যই অংশীদারিত্ব একটি ক্ষিপ্র ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়, যা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে সঠিক পথে চলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় নমনীয়তার যোগান দেয়। এর ফলে তৈরি হওয়া নেটওয়ার্কিং এমন একটি কৌশলকে প্রতিফলিত করে যেখানে দ্বিপাক্ষিক, ক্ষুদ্রতর অংশীদারিত্ব (যেমন, ত্রিপাক্ষিক, চতুর্পাক্ষিক), এবং বহুপাক্ষিক বিন্যাসগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ক্ষমতা বর্ধনকারী এককে পরিণত হয়।

"চীন সমস্যা"-র উত্তরে ভারতের নির্মিত নেটওয়ার্কিং প্রতিক্রিয়া এমন পরস্পর সংলগ্ন কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা সামরিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলির উপর জোর দেয়। এর উদ্দেশ্য হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে কৌশলগত প্রতিরোধকে আরও জোরাল করে তোলা ও চীনের অর্থনীতির উপর নির্ভরতা কমান। এই নেটওয়ার্ক, এবং পরবর্তীকালে, স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই, ভারতের সর্বপ্রধান কৌশলের একটি মূল উপাদান হল ভারতের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ।

ভারত-জাপান অংশীদারিত্বের বিনির্মাণ

অর্থনৈতিক পরিপূরকতা এবং তাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে চীনের প্রবেশ নিয়ে একই ধরনের আশঙ্কা, স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারত ও জাপানকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। গত দশকে, বিশেষ করে জাপানের জাতীয় নিরাপত্তারমূলক অবস্থান শান্তিবাদ থেকে সরে যাওয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের উদীয়মান মর্যাদা, দুই দেশের সরকারের হাতেই কিছু সুযোগ তুলে দেয়। দুই দেশের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক কোনও তফাৎ না থাকলেও, স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন তারা পরস্পরের থেকে সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখে চলত। ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে অস্বাচ্ছন্দ্য ও এর মৈত্রীচুক্তি প্রক্রিয়া (জাপান সহ), এবং এর আত্মনির্ভর অর্থনৈতিক কল্পনা যা টোকিওর রপ্তানী-কেন্দ্রিক অর্থনীতির বিপরীতে যায় – এই সবই তাদের এই অবস্থানের মূল কারণ ছিল। তা বদলে যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে, যখন বিনিময়ের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, এশিয়ার সফলতর অর্থনীতিসহ দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহ রাও ভারতের "পূর্বের দিকে তাকাও" নীতিটি (১৯৯৩ সাল) অনুসরণ করতে শুরু করেন। ১৯৯৮ সালে ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার মত একটি সামান্য সমস্যা ছাড়া (জাপান তখন ভারতের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে ও নিষেধাজ্ঞা জারী করে), এই সম্পর্কের গতিপথ মোটামুটি ইতিবাচকই থাকে এবং ২০১৮ সাল নাগাদ মোদী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিঞ্জো আবের হাত ধরে এই সম্পর্ক "বিশেষ কৌশলগত ও বিশ্বজনীন অংশীদারিত্বে" উন্নীত হয়।

দ্বিপাক্ষিক বন্ধনের কারণে, ভারতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পদমর্যাদার নানা দিকের স্পষ্ট বিকাশ ঘটেছে। মোদী সরকার ও জাপানের আরও কাছাকাছি যাওয়ার বৃহত্তর কারণটি হল, প্রাথমিকভাবে চীন-ভারত সম্পর্কের প্রবল অবনতি। ২০২০ সালের জুলাই মাসে, অতিমারী যখন তুঙ্গে, সেই সময় গালওয়ানের যুদ্ধ ঘটে এবং চীনের বিষয়ে ভারতের গণনায় একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। বেইজিঙের বিরুদ্ধে কৌশলগত প্রতিরোধকে জোরালো করার অবলম্বন হিসেবে, নতুন দিল্লী খুব দ্রুত জাপানের মত মৈত্রশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলে। "স্থিতাবস্থাকে পরিবর্তনের একতরফা প্রয়াস"-এর বিরোধিতার মাধ্যমে জাপান তার সমর্থন ঘোষণা করে। এফডিআই-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্য হল সামর্থ্যের নির্মাণ এবং জাপানের ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স (ওডিএ)-এর মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ঋণদান।

জাপান দ্বিতীয় দেশ – প্রথমটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – যার সঙ্গে ২০১৯ সালে ভারত শাসকস্তরে ২+২ সংলাপের আয়োজন করে, যেখানে এমন একটি কাঠামো তৈরি করা হয়, যাতে দুই দেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়মিতভাবে বার্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারেন। উপরন্তু, সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে সামিল করে যুগ্ম সামরিক কুচকাওয়াজ এবং প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা বিষয়ক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির হস্তান্তর (২০১৫) সংক্রান্ত চুক্তি সহ সামরিক-প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং মিলিত লজিস্টিকাল সহায়তা (২০২০ সালের অ্যাকুইজিশান অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং এগ্রিমেন্ট) – এগুলি সবই এমন একটি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যাবলীর ইঙ্গিত দেয়, যার অগ্রগতি বেশ দ্রুত ঘটছে। অংশীদার দেশগুলির "নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা"-র সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন ওভারসিজ সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্স (ওএসএ) সহ জাপানের ওডিএ কার্যক্রমকে বিস্তৃত করা নিয়ে কিশিদা সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণাটিকে ভারত স্বাগত জানাবে।

নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার'জ গ্রুপের (২০০৮) মত মর্যাদাপূর্ণ সংঘে ভারতের প্রবেশকে জাপানের সমর্থন এবং আঞ্চলিক এবং ইন্দো-প্যাসিফিক সংগঠনে নীতি সমন্বয়ের কাজ মিলিতভাবে ভারতের মর্যাদার অ-বস্তুগত দিকটির উন্নতি ঘটায়। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য (অর্থাৎ রাশিয়াকে ধিক্কার জানাতে ভারতের দ্বিধা), চীনের বিষয়ে মিলিত দুশ্চিন্তা ভারত-জাপান সম্পর্ককে চালনা করে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। তাদের এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতিকে রক্ষা করতে দুই দিকই তাই কিছু বিষয়ে ভিন্নমত হতে একমত হয়। এই সিদ্ধান্তের তাদের ত্রিপাক্ষিক ও চতুর্পাক্ষিক নেটওয়ার্কও উপকৃত হয়।

ত্রিপাক্ষিক বিন্যাস এবং কোয়াড

পুরনো মৈত্রীবন্ধন দুর্বল হওয়া থেকে শুরু করে, বৃহত্তর বহুপাক্ষিক কাঠামো অসারতা পর্যন্ত, নানা কারণে রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্রতর অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনাকে বেশী মূল্য দিতে শুরু করেছে। অংশীদার দেশের সঙ্গে হেজিং (ঝুঁকির সম্ভাবনা কমানর প্রক্রিয়া), সফট-ব্যালেন্সিং (ভারসাম্য রক্ষার অসামরিক উপায়), বা অবস্থানের সমন্বয় সাধনের কাজে এই ধরনের ব্যবস্থা সহায়তা করে। ভারত-জাপান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২০১১ সাল থেকে) ও ভারত-জাপান-অস্ট্রেলিয়া (২০১৫ সাল থেকে) সংলাপের মত ত্রিপাক্ষিক বিন্যাসের মধ্যে থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কাজ করে, ভারত ও জাপান তাদের বর্তমান সম্পর্ককে আরও জোরালো করে তোলে। দুই-ই শুরু হয়েছিল এমন সময়, যখন নতুন দিল্লী ঝুঁকি থেকে দূরে থাকার এবং বেইজিং-এর সঙ্গে খোলাখুলি বিরোধিতা এড়িয়ে যাওয়ার অবস্থান নিয়েছিল। কাজের উদ্দেশ্যের দিক থেকে যেমন, ভারত-জাপান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিপাক্ষিক বিন্যাসের প্রচেষ্টা হল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উন্নয়নের বিকল্প পন্থা নির্ধারণ এবং ভারত-জাপান-অস্ট্রেলিয়া সংলাপের লক্ষ্য হল, ইন্দো-প্যাসিফিকে সাপ্লাই চেইন রেসিলিয়েন্স তৈরির জন্য অতিমারীর কারণে সৃষ্টি হওয়া বিশৃঙ্খলাকে সম্বোধন করা। ত্রিপাক্ষিক বিন্যাস তাই চতুর্পাক্ষিক সম্মিলন, অর্থাৎ কোয়াডের কার্য-পদ্ধতির অভিমুখে একটি পদক্ষেপ, যা ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অতিরিক্ত সুবিধা তুলে দেয়।

২০১৭ সালে দ্বিতীয় দফার কোয়াড শুরু হলে, একটি তুমুল আত্মপ্রত্যয়ী চীন, যে "নিয়ম-নির্ভর বিন্যাস"-কে ক্রমাগত অবমূল্যায়ণ করে যাচ্ছে, তাকে নিয়ন্ত্রণের অভিপ্রায়ের বিষয়ে চারটি সদস্য দেশই দৃঢ়ভাবে ঐকমত্য হয়। একত্রে তারা একটি এফওআইপি-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, বেইজিঙের লুণ্ঠনকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও ঋণদানের চর্চার সমালোচনা করেছে এবং তাদের নিজেদের অর্থনীতিকে তার থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমদিকে সরাসরি চীনের বিরোধিতা করা নিয়ে দ্বিধা থাকলেও, ২০২০ সালে ভারত-চীন লড়াই-এর পর থেকে ভারত এই সংগঠনের প্রতি তার দায়বদ্ধতাকে চিহ্নিত করেছে এবং কোয়াডের কার্যসূচীকে সেই স্বার্থের দিকে চালিত করতে দ্বিধা করে নি। অতিমারীর বিশ্বজনীন প্রভাবের সঙ্গে মিলিতভাবে, চীনের বিষয়ে এখন চারটি সদস্য রাষ্ট্রেরই স্পষ্ট অবস্থান আছে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া অংশীদারিত্ব, যাকে এক সময় এই গোষ্ঠীর দুর্বলতম

সংযোগ বলে ধরা হত, সেই সম্পর্কটি ২০২০ থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উন্নতিলাভ করেছে এবং দুই দিকই এখন অর্থনৈতিক পরিপূরকতা নির্মাণের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এমনকি মালাবার নৌবহর অনুশীলনে (ভারত, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে) যোগ দিয়েছে। এই বছর প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতীরে কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে কোয়াড নৌবহরের মধ্যে সামরিক আন্তঃকার্যক্ষমতার সম্প্রসারণও হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব দৃঢ়তর হলে বৃহত্তর অংশীদারিত্বকেন্দ্রিক বিন্যাস উপকৃত হয়, যার ফলে সামগ্রিক কার্যক্ষমতাও উন্নত হয়।

কোয়াড যদিও কোনও এশিয়ান ন্যাটো নয় এবং তা-ই হয়ত কোয়াডের সব চেয়ে বড় শক্তি। কোয়াড আদতে শিথিল ভাবে সংযুক্ত সমমনস্ক অংশীদার রাষ্ট্রের পরস্পর-সংযুক্ত বিন্যাস, যারা একত্রে একটি বৃহত্তর লক্ষ্যের অভিমুখে কাজ করে চলেছে। তাদের কথোপকথন মূলত অসামরিক উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ঘটলেও, যদি দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক পদ্ধতিকে খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, চারটি সদস্য দেশই নিয়মিত নিরাপত্তাকেন্দ্রিক সহযোগিতা, তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং লজিস্টিক্সভিত্তিক সহায়তা প্রতিষ্ঠা করেছে। একই সময়ে, চতুর্পাক্ষিক কাঠামোর একটি অ-বস্তুগত, আদর্শ-নির্ভর কেন্দ্রও আছে, যা, ২০১২ সালে এফওইপি-র কার্যসূচীর প্রচারের সময় আবে "গণতান্ত্রিক হীরক" হিসেবে ঘোষণা করেন।, ভারত-জাপান অংশীদারিত্বের একটি গঠনমূলক ভূমিকা আছে এমন একটি নেটওয়ার্কিং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, এই ধরনের আদর্শ-ভিত্তিক সংযোগ ভারতের মর্যাদা সন্ধানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে যা, "নিরাপত্তা জাল সরবরাহকারী" হিসেবে নতুন দিল্লীর নিজেকে নিয়ে যে কল্পনা, তার কেন্দ্রে আছে।

কিশিদা যেমন মন্তব্য করেছিলেন, টোকিওর গণনা অনুযায়ী, নতুন দিল্লী নিশ্চিতভাবেই একটি "অপরিহার্য" অংশীদারের পরিণত হয়েছে। জাপানের দিক থেকে, "তার মিত্রশক্তি এবং সমমনস্ক দেশের মধ্যে একটি বহুস্তরীয় নেটওয়ার্কের"-এর বিকাশের জন্য ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জাপান তার ২০২২ ন্যাশনাল সিকিওরিটি স্ট্র্যাটেজিতে সূচিত করে, যা সদাপরিবর্তনশীল বিশ্বজনীন বিন্যাসের প্রতি জাপানের নিজের নেটওয়ার্ক-নির্ভর প্রতিক্রিয়ারই প্রতিফলন। ভবিষ্যতে কোনও রকম দ্বন্দ্বের সরাসরি কারণ না থাকায়, ভারত-জাপান অংশীদারিত্বের বিষয়ে পূর্বাভাস ইতিবাচকই রয়েছে।

সুমিতা নারায়ণন কুট্টি লন্ডনের কিং'স কলেজের ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়ার স্টাডিজের সেন্টার ফর গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজির লিভিরহিউম ডক্টরাল ফেলো এবং আরএসআই সিঙ্গাপুরের একজন অ্যাডজানক্ট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট। তিনি *ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স* জার্নালে প্রকাশিত মোদী'জ ইন্ডিয়া অ্যান্ড জাপানঃ নেস্টেড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপস নামের প্রবন্ধটির সহলেখক এবং *ইন্ডিয়া অ্যান্ড জাপানঃ অ্যাসেসিং দা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ* বইটির সহসম্পাদক (রাজেশ বাসরুরের সঙ্গে)।